মঞ্চ সংবাদ

MANCHA SAMBAD

मंच संवाद

মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ১ সংখ্যা ১ □ মার্চ ২০০৪

Declaration No. 21 dated 16.2.2004

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ...

আমরা একটা দৃষ্টান্ত চেয়েছিলাম.....১

চি ঠি প ত্র ...

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তৃপক্ষের ২

কেমন আছেন? আপনি কিংবা আমি ... ? ২

An Appeal ২

স্বদেশ স্বকাল স্বজন ...

প্রসঙ্গ শিশুশ্রমিক ৩

একবার মাটির দিকে তাকাও, একবার ...

টাকি থেকে হাসনাবাদ — ৪

নাগরিক মঞ্চ : ফেলে আসা দেড় দশক ...

চাই শুভ ভবিষ্যতের দিশা ৬

পথ চলা শুরু — 'ঘুমাবার আগে আয়োজন ৬

নাগরিক মঞ্চের প্রথম দু বছর ৭

সলতে পাকানোর কাজটাও তো বড় কম ৮

অপনী বাত ৮

আগামী সংখ্যা এপ্রিল ২০০৪-এ

চিঠিপত্র ও সরাসরি যোগাযোগ :

সম্পাদক

মঞ্চ সংবাদ

১৩৪, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড

রুম নং ৭, ব্লক বি, প্রথম তল

কলকাতা ৭০০ ০৮৫

[রবিবার ও ছুটির দিন বাদে

প্রতিদিন দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৮.০০ টা]

স ম্পা দ কী য়

আমরা একটা দৃষ্টান্ত চেয়েছিলাম

সুকুমার সে, বন্ধ কারখানা মেটাল বক্সের শ্রমিক। বয়স ৪৫। আত্মহত্যা করলেন।

উত্তরবঙ্গের উনিশটি বন্ধ চা বাগানের প্রায় চারশো শ্রমিক অনাহারে মারা গেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ত্রিশহাজার।

রাজ্যে ৫৭ হাজার বন্ধ বা রুগ্ন শিল্পের অসংখ্য শ্রমিক আত্মহত্যা বা অনাহারে মারা যাচ্ছেন।

এসব তথ্য অনেকেরই জানা। শুধু দায়বদ্ধ সরকার এ-তথ্য মানেন না — কেননা এরাজ্যেই বন্ধ কারখানার প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রমিকের জন্য মাসিক পাঁচশো টাকা সাহায্যভাতা সরকার দিয়ে থাকেন। কারখানা বন্ধ। বিকল্প জীবিকায় ন্যূনতম মজুরি নেই। পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা।

মৃত সুকুমারের কারখানা আজ জঙ্গলে ঘেরা কবরখানায় রূপান্তরিত। আচ্ছা, সত্যিই কি কিছু করার ছিল? সরকার চাইলেই কি এই ব্যবস্থায় শ্রমিকের অনাহার, আত্মহত্যা, মৃত্যু রোধ করতে পারে? আমাদের চারপাশে ধোপদুরস্ত মানুষের এরকম হরেক প্রশ্ন। হয়তো এসব মৃত্যু অনেককেই দুঃখ দেয়, বিচলিত করে। অনেকেরই আজ প্রতিবাদের অভ্যাস ত্যাগ করতে মায়া হয়। আবার অন্যদিকে ভয় হয় এসবের ফলে প্রতিক্রিয়ার হাত শক্ত না হয়ে যায়। তাই সত্য আড়াল খোঁজে।

সুকুমারদের মৃত্যুতে কারুর কিছু এসে যায় না। শুধু কাঁদে তাঁর পরিবার এবং অসহায় আত্মীয়-বন্ধু প্রিয়জন। কিন্তু এমনটা হওয়ার কথা কি ছিল? অনেক আশা, আশ্বাস, অন্তত আইন মেনে চলবার এবং ওদের মানানোর সব অঙ্গীকার কোথায় গেল? এটা আমরা এতদিনে সবাই জেনে গেছি কারখানা বন্ধ হয় মালিকের ইচ্ছায়, খোলেও মালিকের ইচ্ছায়। এটা তাঁর আইনত অধিকার। এটা দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের বেঁচে থাকার দৃষ্টান্ত। কিন্তু শ্রমিকের প্রাপ্য গ্রাচ্যুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বকেয়া বেতন এসব না দিয়েই তো বছরের পর বছর বন্ধ। এসব দেওয়ার কোনো আইনত দায় নেই? — সরকার আইনরক্ষক তাঁর কোনো দায়িত্ব নেই? কেন এরাজ্যের বামপন্থী সরকার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা একথাটুকু বলতে পারলেন না যে, এরাজ্যে মালিক যদি বে-আইনীভাবে বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধ রেখে শ্রমিকের আইনত প্রাপ্য বকেয়া না দেয় তবে সেই কারখানা হুকুম দখল করে মালিক বা ডিরেক্টরদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নীলামে বিক্রি করে শ্রমিকের বকেয়া মেটানো হবে। হ্যাঁ, জোর দিয়েই বলছি দেশের আইন মেনেই একাজ করা যেত। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে টিটাগড়গেড়িয়ায় শ্রমিকদের বকেয়া আঠারো লাখ টাকা আদায় এভাবেই সম্ভব হয়েছে। স্বল্পক্ষমতায়, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে একাজ যদি সম্ভব হয় তবে সরকার এ-কাজ করতে পারেন না কেন?

একজন শ্রমিক ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিল তিল করে যে অর্থ প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা করেছিল — সে টাকা মেরে দিয়েছে এমন মালিকের সংখ্যা আজ বেশি এ-রাজ্যে। বকেয়া পরিমাণ প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। অগ্রগতির অনেক দৃষ্টান্ত রাজ্যবাসী অহরহ শুনছেন। ঠিক-বেঠিকের অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তাদের আছে। সে সব কথা না হয় থাক। আমরা শুধু চেয়েছিলাম, বিগত বছরে এত শ্রমিকের কর্মহীন হয়ে পড়া, এত আত্মহত্যা-অনাহার-অসুস্থতা-মৃত্যু ......

হ্যাঁ, সরকার শ্রমিককে মাসিক ভাতা দিয়ে নৈতিক দায় মেনে নিয়েছেন। কিন্তু চূড়ান্ত এই অবস্থার জন্য যারা দায়ী সেই সব বেওসায়ি-মালিকদের বিরুদ্ধে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হলো না কেন? বিনিয়োগ হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে? নির্বাচন এসে গেছে, — দেওয়ালে দেওয়ালে আবার শ্লোগান :

'শ্রমিকের আইনি অধিকার খর্ব করার সরকার
আর নেই দরকার'। □

মূল্য : ৩ টাকা

চি ঠি প ত্র চি ঠি প ত্র চি ঠি প ত্র চি ঠি প ত্র চি ঠি প ত্র চি ঠি প ত্র চি ঠি প ত্র চি ঠি প

মঞ্চের কাছে নাগরিক অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তৃপক্ষের কাছে যে অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা হলো না

বিধাননগরের পূর্বাচল আবাসনের (ক্লাস্টার ৪) অধিবাসীদের পক্ষ থেকে একটি সমস্যার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের আবাসনের বিপরীতে নবনির্মিত হায়াত রিজেন্সি হোটেল। সারা দিন ধরে উচ্চ গ্রামে মাইক্রোফোন চালিয়ে আমাদের জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এই ঘোষণা অন্তত রাত একটা পর্যন্ত চলে। হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা বারবার মৌখিক এবং লিখিত আবেদন জানিয়েছি। রাজ্য দূষণ পর্ষদের কাছেও আবেদনপত্র জমা দিয়েছি। (প্রতিলিপি সঙ্গে দিলাম)। গত ১ ফেব্রুয়ারি প্রায় ২৫ জনের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রটি গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শ্রীদেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু দুদিন পরেই তীব্র আকারে শব্দ দূষণ শুরু হয়েছে। নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আপনি যদি সমস্যাটির প্রতি একটু মনোযোগ দেন, আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করব। হোটেলের ফোন নাম্বার : ২৩৩৫ ১২৩৪।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্বাচল আবাসন, বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯৭

কেমন আছেন? আপনি কিংবা আমি ...?

নির্বাচন এসে গেল। ভাল থাকার বা ভাল রাখার গালগল্পে বাজার প্রায় জমজমাট। ভারত উদয় যাত্রা শুরু হয়েছে। আশঙ্কিত, আতঙ্কিত সবাই। যাত্রাপথের কিংবা তার চারপাশের মানুষজন এবং আমরাও। হানাহানি, দাঙ্গা, লুঠতরাজ-এর দুঃস্বপ্ন বুঝি আবার ফিরে এল। কেন্দ্রীয় সরকারের পাঁচবছরের রাজ্যপাট সদ্য শেষ হয়েছে। সবাই কেমন ভাল আছে তাঁর এক লম্বা ফিরিস্তি সরকারি অর্থে বহুল প্রচারিত। কিন্তু এরা কী সত্যিই ভালো আছে? কিছু নমুনা এখানে দেওয়া যাক — তাহলে নিজেই বুঝবেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত চটশিল্প এন. জে. এম. সি। পশ্চিমবঙ্গে ৫টি ইউনিট এবং বিহারে ১টি ইউনিট। বেশ কিছু বছর আগে দৈনিক উৎপাদন ছিল ৪২৫ টন — সবকটি ইউনিট ধরে। এখন সেখানে উৎপাদন ৩৫ টন। শ্রমিক, কর্মচারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশহাজার যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে বারো হাজার। শ্রমিক, কর্মচারীর বকেয়া প্রভিডেন্ড ফাণ্ড ১৩৫ কোটি টাকা। ই.এস. আই. বাবদ বকেয়া ৪০ কোটি টাকা। এর ফলে শ্রমিক, কর্মচারী কোনো চিকিৎসাগত সুবিধা, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, অসুস্থতাজনিত ছুটি সবকিছু থেকেই বঞ্চিত। এন জে এম সি শ্রমিক, কর্মচারীদের বকেয়া বেতন প্রায় ৩০ কোটি টাকা। বেতন বকেয়া রাখা শ্রম আইননুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ তবু কেন্দ্রীয় সরকার নিজের তৈরি শ্রম আইন নিজেই ভেঙে চলেছেন।

এই সংস্থা থেকে অবসর নিয়েছেন বিগত বছরে যেসব কর্মচারী তাঁদের কেউই গ্র্যাচুইটি পাননি। কারখানা চালু আছে। পানীয় জল নেই, আলো নেই, এক দুর্বিসহ অবস্থা। কারখানার ভেতরে কোয়ার্টারে থাকেন যেসব শ্রমিক, কর্মচারী তাদের বাসস্থানে জল নেই, আলো নেই, নাজেহাল অবস্থা। পরীক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদের অবস্থা তো অবর্ণনীয়। মাইনে না পেয়ে, অর্দ্ধাহারে, অনাহারে মারা গেছেন, আত্মহত্যা করেছেন ৬ জন শ্রমিক কর্মচারী।

এমন অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক নেতা, নেতৃরা হয়তো বেশ ভাল আছেন — উঁয়ারা আরও ভাল থাকুন। কেননা মূল্যবান জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা রাজনীতিকরা এখন জনগণকে 'ফিল গুড' বোঝাতে ব্যস্ত। □

AN APPEAL

Some of our well-wishers opine that Nagarik Mancha should accept the foreign, native, governmental & non-governmental financial aid. Yes, we are facing this delicate issue today. Nagarik Mancha started its journey to find out an alternative path – depending on the voluntary labour of a handful few and some monetary help of their friends. Was it wrong? No, it wasn't, we don't think so. Yes, its true that, today, we don't have even the least capacity to meet the bare necessities. Under this circumstances, some get astonished. and some angry thinking us to be non-co-operative when we turn thier help down. Nay, this cann't go for long. Something has to be done immidiately.

To be honest, we are really doubtful about the 'humane mask' of foreign and native financial aid. In such a situation, for the survival and support to those who need us the most, we appeal – please stand by us. your presence and help are earnestly solicited. □

নাগরিক মঞ্চ প্রকাশিত গ্রন্থমালা :

১.

২. পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয়শিক্ষা কোন্ পথে
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. বঞ্চিত নারী : সেকাল একাল
প্রজ্ঞা পারমিতা দত্ত রায় চৌধুরী

৪. আইনের বর্ণপরিচয়
মধুমিতা রায় চৌধুরী (আমেদ)

৫. সাম্প্রতিক কলকাতা : পরিকল্পনা উন্নয়ন উচ্ছেদ
কেয়া দাশগুপ্ত

নাগরিক মঞ্চ-র সহযোগী সদস্য/সদস্য/শুভানুধ্যায়ী/সমর্থকদের অবগতির জন্য জানাই এখন থেকে নাগরিক মঞ্চ সংগঠন 'পূর্ব কলকাতা নাগরিক মঞ্চ' নামে কাজ করবে। প্রসঙ্গত, সংস্থার উদ্দেশ্য/লক্ষ্য/কাজের এলাকা ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকছে।

প্রসঙ্গ : শিশুশ্রমিক

নব দত্ত

শিশু শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটা দিবস আছে, সরকার ঘোষিত নানান কর্মসূচি আছে — আছে কয়েকশো কোটির দেশী-বিদেশী অর্থ বরাদ্দ। তবুও হাওড়ার বাগনানের হাতুড়িয়ার বাজি কারখানায় মৃত ও জীবিত পঙ্গু শিশু শ্রমিকরা হাইকোর্টের নির্দেশের প্রায় আটবছর পরেও ক্ষতিপূরণ অর্থ পায় না। অথচ শিশু শ্রমিকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাসহ ধীরে ধীরে শিশু শ্রম নির্মূল করার লক্ষ্যে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সারা দেশের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ২৪৮.৬০ কোটি টাকা।

শিশু শ্রমিকদের জন্য এদেশে প্রথম আইন হলো দ্য চিলড্রেন (প্লেজিং অফ লেবার) অ্যাক্ট। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল শিশু শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে মাতাপিতার মাছ থেকে অর্থ/ঋণ-এর বিনিময়ে শিশু শ্রমিক নিয়োগের যে প্রচলিত পদ্ধতি তা রোধ করা। এদেশে ব্রিটিশ শাসনেই, ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক উৎপাদন-নির্ভর শিল্পে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করা এবং ১৫ বছরের নীচে শিশু শ্রমিক কোনো ক্ষেত্রেই নিয়োগ করা যাবে না, এই আইন পাশ (১৯৩৮) (দ্য এমপ্লয়মেন্ট অফ চিলড্রেন অ্যাক্ট) হয়। তারপরে একে একে এল অনেক আইন যেমন, ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট যাতে শিশু শ্রমিকের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে সর্বপ্রথম বেশ কিছু ব্যবস্থার কথা বলা হলো। এই আইনে রাত দশটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত শিশু শ্রমিককে কাজ করানো যাবে না। কিংবা নিয়োজিত শিশু শ্রমিককে কোনো অবস্থাতেই সাড়ে চার ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। যাদের বয়স ১৪ থেকে ১৫ বছর তাঁদেরকেই শিশু শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে তবে বয়সের প্রমাণ হিসেবে সার্টিফিকেট দিতে হবে। এই ধরণের একাধিক নির্দেশের কথা বলা হলো। ভারতীয় সংবিধানে ২৪নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে ১৪ বছরের নীচে কোনো শিশুকে ফ্যাক্টরি বা খনিতে ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক শিল্প শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না। অনুচ্ছেদের এই অংশটি নিয়ে প্রশ্ন উঠল — ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক শিল্প কাকে বলা হবে? অন্যদিকে বয়স নিয়ে বিতর্ক তো ছিলই। স্বাধীনতার আগে ও পরে একাধিক শ্রম ও শিল্প সংক্রান্ত আইন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নানান বয়সকে অর্থাৎ ১২/১৪/১৫ নিম্নসীমা ধরে নিয়ে শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৩টি পেশা ও ৫৭ ধরণের ক্ষতিকর (হ্যাজাডার্স) উৎপাদনী প্রক্রিয়াকেও বিপজ্জনক শিল্প বলে চিহ্নিত করে এবং এসব ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না জানিয়ে আইন তৈরি হলো 'দ্য চাইল্ড লেবার (প্রহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট' ১৯৮৬। এই আইনে বলা হলো, রাত সাতটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত কোনো শিশু শ্রমিককে কাজ করানো যাবে না। বিড়ি, কার্পেট, সিমেন্ট, কাপড় ছাপানো, দেশলাই, বাজি, সাবান, চামড়া, বাড়ি নির্মাণ, গাড়ি সারানো, ভেন্ডার ইত্যাদি কাজে শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হলো। এই আইন অমান্য করলে দশ থেকে কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করা হলো।

ভারতে, ১৯৯১-এর জনগণনা অনুযায়ী ১ কোটি ৪৫ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে। এর মধ্যে ৮৭ লাখ ছেলে এবং ৫৮ লাখ মেয়ে। এই হিসাব থেকেই জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬ লাখের মতো শিশু শ্রমিক রয়েছে। যদিও দেশে মোট কত শিশু শ্রমিক রয়েছে এ-সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে রয়েছে এক চরম বিভ্রান্তি। এবং গত দু-দশক ধরে সরকারি-বেসরকারি অসংখ্য এজেন্সি নানান সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে চলেছেন এই বিষয়ে। কয়েকটি নমুনা :

১. জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৪৩ তম রাউন্ডে জানানো হয়, দেশে মোট ১ কোটি ৭০ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে।

২. সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারা দেশে শিশু শ্রমিকদের বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। ১৯৯৭-এ সমীক্ষা শেষে জানা যায় : মজুরি-প্রাপ্ত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ১২ লাখ ৬৬ হাজার ৫০ জন। এর পরে বিভিন্ন রাজ্যের বিপজ্জনক উৎপাদনী শিল্পে কাজ করে এমন শিশু শ্রমিকদের নিয়ে একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন সুপ্রিম কোর্টে পেশ হয়। তার থেকে জানা যায়, ৪ লাখ ২৮ হাজার ৩০৫ জন শিশু ক্ষতিকর উৎপাদনী প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত শিল্পে কাজ করেন। এই দুই পর্যায়ের সমীক্ষা থেকে শিশু শ্রমিকদের যে সংখ্যা বেরিয়ে আসে সুপ্রিম কোর্ট তাকে যুক্ত করেই দেশের সর্বমোট শিশু শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত সমীক্ষায় শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত মোট পরিসংখ্যান সম্পর্কেও সংশ্লিষ্ট মহলে সংশয় প্রকাশ করা হয়।

৩. ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০, দেশের আইনমন্ত্রী জানাচ্ছেন, দেশে সর্বমোট ২ কোটি শিশু শ্রমিক কর্মরত। ভারতে শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত একটি বিকল্প প্রতিবেদনে বলা হয়, ৭ কোটি ৭০ লাখ শিশু শ্রমিক দেশে রয়েছে, এই প্রতিবেদনটি ১৯৯৯ সালে CACL সংস্থার তৈরি। ১৯৯৫-এ আই এল. ও. প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে, ১ কোটি ৪৮ লাখের মতো শিশু অর্থকরী কাজে নিযুক্ত। এদের বয়স ১০-১৪ বছরের মধ্যে এবং তারা মোট শিশু জনসংখ্যার ১৪.৩৮ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

শিশু শ্রম সংক্রান্ত একাধিক আইন হলেও তার কার্যকারিতা কতটুকু হয়েছে তা নিয়ে প্রয়োগ কর্তাদের মধ্যেও সন্দেহ আছে। অবস্থার বিশ্লেষণে দেখা যায়, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটেছিল আইনের মাধ্যমে, তা ছিল শুধু কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ এবং কয়েকটি বিপজ্জনক বলে ঘোষিত পেশা বা প্রক্রিয়ায় শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা। এমনটাই চলছিল, নানান সরকারি ঘোষণা, আন্তর্জাতিক এজেন্সির অর্থসাহায্য, যোজনা কমিশনের অর্থবরাদ্দ ইত্যাদি, ইত্যাদি। পরিস্থিতি অন্যরকম মোড় নিল যখন ১৯৯৬-এর ১০ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট এই সংক্রান্ত এক ঐতিহাসিক রায় দিলেন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইনের অবস্থান, বিধি-নিষেধের উপস্থিতি, সরকারি উন্নতির মুখোশটি উন্মোচিত করলেন। ঐ আদেশে বলা হলো, ভারতের সমস্ত রাজ্য সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা সমীক্ষা করে জানাবেন যে, সেই রাজ্যে কত শিশু শ্রমিক রয়েছে। যে সব শিশু শ্রমিক 'বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত' শিল্পে নিযুক্ত তাদের কর্তৃপক্ষ /মালিক শিশু শ্রমিক পিছু কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে এবং পরিবারের একজনকে ঐ শিল্পে নিয়োজিত করবে। যেখানে এই নিয়োগ সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটি ওয়েলফেয়ার ফান্ড তৈরি করবেন যার থেকে ঐ শিশু শ্রমিকটির পরিবারকে অর্থ সাহায্য দিতে হবে। ক্ষতিকর নয় এমন শিল্পে যে-সব শিশু শ্রমিক কাজ করবে তার মালিক/কর্তৃপক্ষকে দিনে দু ঘণ্টা ছুটি দিতে হবে যাতে শিশুটি পড়াশোনা করতে পারে। এবং এই বাবদ যে খরচ হবে তাও ঐ মালিক বা কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭-এর জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা এবং কলকাতার শ্রম কমিশনারের তত্ত্বাবধানে এক সমীক্ষা চালান। সেই সমীক্ষায় তাঁরা মাত্র ২৫৪ জন শিশু শ্রমিক খুঁজে পান 'বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত' শিল্পে এবং ১৫ হাজার শিশু শ্রমিকের হদিস পান বিপজ্জনক

নয় এমন শিল্পে। লক্ষণীয় যে, বিপজ্জনক শিল্পে নামমাত্র খুঁজে পাওয়া ২৫৪ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জনের মালিকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায় করা সম্ভব হয়েছে। এই রকম একটি অবিশ্বাস্য রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিন সুপ্রিম কোর্টে পাঠিয়েছিলেন। শিশু শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে অসংখ্য রিপোর্ট থেকে একটা বিষয় নজর করার মতো যে, যেসব শিশু এই অমানবিক ব্যবস্থায় শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছে তাদের শতকরা ৮০ শতাংশই হলো জনজাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর মানুষদের বঞ্চনার কোনো বড় রকমের রদবদল না ঘটলে এই শ্রম-ব্যবস্থার অবসান ঘটবে না।

মনে রাখতে হবে, আমাদের রাজনৈতিক সমাজ অনেকদিন হলো প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাসের ঢেকুর তুলে চলেছে। সংবিধান ও আইনের প্রতি দায়বদ্ধ এক সরকার কোর্টের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ন্যূনতম তথ্যের সততা বজায় রাখতে পারেন না। এমন অবস্থায় আইন হয়েও কি খুব কিছু লাভ আছে? আমাদের দেশের একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দেশে-বিদেশে আকছার সেমিনার, মিটিং, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে সমস্যার আর্থ-সামাজিক সহ বহু বহু দিক নিয়ে বিচিত্রমুখী আলোচনায় বহু বিনিদ্ররজনী কাটান; লাখ লাখ পৃষ্ঠার (এবং অর্থ খরচে) পেপার তৈরি করেন।

আর এসবে বিতর্ক বাড়ে, বিদেশী অর্থ দাতাদের নজর পড়ে, টাকা আসে শিশু শ্রমিকদের পড়ানোর জন্য, এন.জি.ও-র সহযোগিতায় স্কুল হয় (যেমন আটটি জেলায় এ-রাজ্যে ৩৪৭টি স্পেশাল স্কুল চলছে) স্কুলের দিদিমণি বেতন পান পাঁচশো থেকে হাজার টাকা। এ-রাজ্যের একাধিক জায়গায় এমন স্কুল এবং ছাত্রদের হদিশ পাওয়া যাবে, যেখানে একই শিশুর একাধিক এন.জি.ও. পরিচালিত স্কুলে নাম লেখানো রয়েছে। উদ্দেশ্য মাথাপিছু পড়ানোর জন্য বরাদ্দ অর্থ কিভাবে ফন্দিফিকিরের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা যায়। বর্তমানে অনেকগুলি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের একাধিক রাজ্য শাখার সম্পদ ও স্বাস্থ্যের পেছনের রহস্য হলো এটাই।

এবং এই কারণেই দেশের অনেক সংস্থাই যারা শিশু শ্রমিক কল্যাণে প্রকাশ্যে অনেক কিছু বললেও সরকারের শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত ঘোষিত নীতির এবং বরাদ্দ বিপুল অর্থের কার্যকর না-হওয়াকে কেন্দ্র করে সরব হন না। শিশু শ্রমিকদের এক বৃহদাংশই আজ বন্ডেড লেবার। হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে চলতি ব্যবস্থায় শিশু শ্রম পুরোপুরি বিলোপ করা যাবে না। কিন্তু শিক্ষা ও সুরক্ষার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা তো করাই যায়। আর যদি বা তা না-ই করা যায় তবে আর আইন বা আদালতের নির্দেশের প্রয়োজন কোথায়? □

একবার মাটির দিকে তাকাও, একবার মানুষের দিকে .....

টাকি থেকে হাসনাবাদ — অসংগঠিত শ্রমিকদের মানববন্ধন

২৩ ফেব্রুয়ারির "মানব বন্ধন" কর্মসূচি উপলক্ষে শ্রমজীবী সমন্বয় কমিটির জনগণের প্রতি আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে অসংগঠিত শ্রমিকরা ক্রমশ সংগঠিত হচ্ছেন। প্রায় ২ কোটি ১৫ লাখ শ্রমজীবীর মধ্যে মাত্র ২৫ লাখ সংগঠিত শ্রমিক/কর্মচারী। কৃষি শ্রমিক সহ ৫৭ ধরণের পেশায় যুক্ত শ্রমিকরা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির আওতায় পড়েন। বিনিয়োগের আকর্ষণ বাড়াতে রাজ্য সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি অনেক ক্ষেত্রেই নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে পুনরবিন্যাস করেন না। আবার অনেকক্ষেত্রেই ন্যূনতম মজুরিতে যেখানে কাজ করানো হয় সেখানে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেন না। সরকার একথা মানুন আর না মানুন, বাস্তবে আমাদের সবারই অভিজ্ঞতা হলো এই যে, যা ছিটেফোঁটা আইনী রক্ষাকবচ শ্রম-আইনের মধ্য দিয়ে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রয়েছে তার কোনো ব্যবহার হয় না। মালিক-মস্তান-আমলা যোগসাজশে সন্ত্রস্ত পরিবেশে, অনিশ্চিত জীবিকায়, অমানবিক জীবনযাত্রার মধ্যে বেঁচে আছেন অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ। নাগরিক মঞ্চ এইসব শ্রমজীবীদের অধিকার আন্দোলনে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কর্মরত শ্রমিকদের সহযোগী হিসাবে, বন্ধু হিসাবে থাকতে চায়। আর টাকি থেকে হাসনাবাদ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ তাই সংগঠনের দিক দিয়ে একরকম শুরুই বলা যায়। —স.ম.

গোটা ভারতবর্ষের ৯১ ভাগ শ্রমজীবী মানুষই অসংগঠিত ক্ষেত্রের। দেশের মোট আয়ের ৬৮ ভাগই এঁদের দ্বারা তৈরি। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের একটা বড় অংশই কৃষক ও কৃষি শ্রমিক। বাকিরা ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিক — নির্মাণ কাজে, পরিবহণ ও যোগাযোগে, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও মেরামতিতে, গুদামে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং আর্থিক পরিষেবায় যুক্ত। সরকারি "আবিদ হোসেন" কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ ২ কোটি ৮০ লক্ষ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা ৩,৮৭,০০০ কোটি টাকার জিনিস উৎপাদন করেন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই শ্রমিকদের আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি পরিচয়-পত্র দেওয়া হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের ৮১ লক্ষ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে একমাত্র বিড়ি শ্রমিকরাই (৬ লক্ষ) আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিচয়-পত্র আদায় করতে পেরেছেন। বাকি ৭৫ লক্ষের কোনো সরকারি স্বীকৃতি নেই। আমাদের এই অঞ্চলের রাজমিস্ত্রি মজদুর, ইঁটভাটা শ্রমিক, ডেকরেটার্স শ্রমিক, পরিবহণ, বাঁশ-বেত শিল্প শ্রমিক, মৎসজীবী, শ্রমজীবী মহিলা, ভ্যান-রিক্সা শ্রমিক এবং অসংখ্য হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকান-কর্মচারীদের কোনো সরকারি স্বীকৃতি নেই। অথচ ঘটা করে ভোটের আগে অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক বিল ২০০২ (যাতে বৃদ্ধ শ্রমিকদের পেনশনের কথা বলা হচ্ছে) নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে, শ্রমিকরা পেনশন পাবেন।

স্বাধীনতার ৫৭ বছর পরেও দেশের ৪০ ভাগ মানুষ দুবেলা খেতে পায় না অথচ সরকারি গুদামে চাল গম পচে নষ্ট হয় এবং সেই পচা খাদ্য পাহারা দেবার জন্য দৈনিক ৪৭ কোটি টাকার গুদাম ভাড়া দেওয়া হয়। দলে দলে কৃষকরা আত্মহত্যা করছেন কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাবে ফসলের দাম না পেয়ে এবং চাষের খরচ দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ায়। সবুজ বিপ্লবের নামে বিদেশ থেকে আমদানি করা উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক কৃষকের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বিদেশী কোম্পানির আশীর্বাদ পাচ্ছে সরকার আর দেশের ৪০ ভাগ চাষের জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক প্রতিদিন ছাঁটাই হচ্ছেন এবং নিজের প্রাপ্য টাকা না পেয়ে, কারখানার গেট বন্ধ দেখে, কারখানার সামনে আত্মহত্যা করছেন অথবা ফুটপাতে বা বাসে-ট্রেনে গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে রকমারি জিনিসের হকার হয়ে যাচ্ছেন। মালিকরা ন্যূনতম মজুরি দিচ্ছে না, প্রভিডেন্ট ফান্ড/গ্রাচুইটির টাকা মেরে দিচ্ছে, দমবন্ধ পরিবেশে কাজ করছে — সরকার উদাসীন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও গরিবী হটানোর নামে যে প্রকল্প ঘোষণা করা হচ্ছে — সরকারি তরফে যেমন অন্নপূর্ণা, অন্ত্যোদয়, বার্ধক্য ভাতা, মাতৃত্ব সহায়তা, শিশু সুসংহত বিকাশ, পরিবার সহায়তা প্রকল্প — সেগুলির সুবিধা দরিদ্র শ্রমজীবীরা অধিকাংশই পাচ্ছেন না। মহারাষ্ট্র সরকার পারছে অথচ অন্য রাজ্য বছরে ক্ষেতমজুরদের "১০০" দিন সুনিশ্চিত কাজের ব্যবস্থা করতে পারছে না। দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা দরিদ্র মানুষদের নাম বি.পি.এল. তালিকায় থাকছে না, এমনকী দরিদ্র অনেক পরিবার রেশন কার্ড পর্যন্ত পাচ্ছে না তাদের সন্তানরা বিবাহিত হওয়ার পরেও। দেশের সরকার ৫ লক্ষ টাকা বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে প্রতিবছর দেশের মোট আয়ের ২৭ ভাগ টাকা

বিস্ময় (!) অথবা বোধোদয় (!!)

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রায় ৩০ কোটি অসংগঠিত শ্রমিকদের পেনশন, চিকিৎসা বীমা, অকাল মৃত্যুতে এককালীন টাকা এবং মৃত শ্রমিকদের পরিবার পিছু পাঁচশো টাকা মাসিক পেনশন, ইত্যাদি ঘোষণা করলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র লখনউকেই বেছে নিলেন এই সরকারি ঘোষণার জন্য। পরের দিন সংবাদপত্র পড়ে জানা গেল প্রধানমন্ত্রী বিস্মিত এবং কিছুটা নাকি দুঃখিতও এই কারণে যে, স্বাধীনতার পর এতগুলি সরকার এসেছে গেছে অথচ এইসব গরিব মানুষদের জন্য কেউ কোনোদিন কিছু ভাবেননি? যদিও এপ্রশ্ন তাঁকেও করা যায় যে, তিনিও বহুবছর ভারতীয় সংসদের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কোনোদিন কি এ প্রশ্ন সংসদে তুলেছিলেন? তিনিও তো একাধিক সরকারের নানান দপ্তরের মন্ত্রী আর অবশেষে পাঁচবছর প্রধানমন্ত্রী আর তারপর সবশেষে এই নির্বাচনের মুখে তাঁর এই বিস্ময়। কিংবা বোধোদয়!!

বিদেশকে সুদ দিচ্ছে। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে ৩০ ভাগ টাকা দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র কিনছে আর ২৩ ভাগ টাকা দিচ্ছে কর্মচারীদের মাইনে দেবার জন্য। ফলে দেশে ৬ কোটি বেকার যুবক-যুবতী। ৩ লক্ষের উপর কল কারখানা বন্ধ এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নতুন করে বেকারের খাতায় নাম লেখাচ্ছেন। দেশের শিল্পপতিরা ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ করছেন না অথচ ২/৫ হাজর টাকা ঋণ পাওয়া গরিব মানুষকে শাসানো হচ্ছে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতা, আমলা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা গত কুড়ি-বছরে প্রায় ৫৬টি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত প্রমাণিত হয়েছে এবং এর ফলে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা তছরূপ হয়েছে কিন্তু কেউ শাস্তি পায়নি। বা তাদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয় নি। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে শিল্পের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে সেই শিল্পগুলিকে জলের দামে বিদেশী অথবা দেশী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। গোটা বিশ্ব জুড়ে সন্ত্রাসের আসল নায়ক বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারন-আদবানি-মুশারফরা বুক ফুলিয়ে নিরীহ মানুষ, দেশপ্রেমিকদের হত্যা করে তাদেরকেই বলছে সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গি। গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কুখ্যাত নায়ক নরেন্দ্র মোদি গলায় ফুলের মালা পরে ঘুরছে। বিদেশীদের কাছে গোটা দেশকে বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিল্পে উন্নয়নের নামে। অথচ এই শিল্প ৫৭ বছর ধরে ভারতবর্ষে মাত্র ১২ ভাগ মানুষকে কাজ দিয়েছে। সরকার দাবি করছে দেশ এগিয়ে চলেছে — ভারত বিশ্বে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হবে; আসলে ভারত ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৩৪তম জায়গায়। কারণ ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারি, অশিক্ষা, পানীয় জল, বিদ্যুতের অভাব, শিশু মৃত্যু, অপুষ্টির কারণে। এদেশের দরিদ্র শ্রমজীবীদের গণতন্ত্র শুধু ভোট দেবার, আর মাত্র ১৫ ভাগ ধনী লোকেদের অধিকার দেশের সম্পদ লুঠ করবার, ভোগ করবার, উন্নয়নের নামে দেশকে বিদেশীদের হাতে বিকিয়ে দেবার এবং জনগণের উপর কর, খাজনা, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বাড়ানোর কারণ এই দেশের সরকার পরিচালিত হয় দেশের ধনী লোকেদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য এবং "ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারির বিরুদ্ধে সংগ্রামকারীদের ওপর লাঠি, গুলি চালাবার জন্য। তাই, এই প্রহসনের গণতন্ত্রের পরিবর্তে প্রয়োজন প্রকৃত গণতন্ত্রের আর সেই জন্যই প্রয়োজন "ভারতবর্ষের দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের, যে যুদ্ধ একাধারে ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাত, বর্ণের বিরুদ্ধে এবং আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদ-সর্বস্ব তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা, আমলা এবং সমাজ পরিচালকদের বিরুদ্ধে যারা প্রকৃত অর্থেই কুশিক্ষিত। এই প্রচেষ্টা ও দৃঢ় আশা নিয়ে টাকিতে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত হলো এক মানববন্ধন, সেখানে এলাকার শ্রমজীবী মানুষ আওয়াজ তুলেছেন :

১. অবিলম্বে সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সরকারি পরিচয়-পত্র দিতে হবে।
২. দারিদ্র্য দূরীকরণের ৮টি প্রকল্প বাস্তবে কার্যকর করতে হবে।
৩. শ্রমজীবী পরিবারের যাঁরা রেশন কার্ড এখনও পান নি, অবিলম্বে তা দিতে হবে।
৪. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে হবে।
৫. বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম ৫০ টাকা মজুরি দিতে হবে।
৬. রাজমিস্ত্রি-মজুরদের সরকারি কাজে সরকারি মজুরি দিতে হবে।
৭. কৃষকদের সেচ ও বাঁধরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ফসলের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে।
৮. কোনো শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষ অতিরিক্ত কর খাজনা দেবেন না।
৯. বি.পি.এল তালিকা স্কুলে, রেশন দোকানে, পৌরসভা অঞ্চলে টানাতে হবে।
১০. দরিদ্র বাঁশ-বেত শিল্প শ্রমিকদের জিনিস রেলপথে নেবার সুবিধা দিতে হবে।

এই দাবিগুলিকে সমর্থন জানিয়ে প্রচার কর্মসূচিতে 'নাগরিক মঞ্চ' সহযোগী হিসাবে অংশগ্রহণ করে। নব দত্ত টাকি পৌরসভার বি.ডি.ও অফিসে এবিষয়ে বক্তব্যও রাখেন। □

অসংগঠিত শ্রমিক বিল ২০০২-এর খসড়া

দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশনের সুপারিশ-এর ওপর ভিত্তি করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য 'দ্য আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার্স বিল ২০০২' এর খসড়া তৈরি করলেন কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রক ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারিতে এবং তা সংসদেও পেশ করা হলো। দেশে ১২৭ ধরণের পেশা বা কাজকে এবং এর সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবীদের শ্রমিক হিসাবে গণ্য করে এদের মজুরি, চিকিৎসা, পেনশন, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, বাসস্থান, পরিচয়-পত্র, ইত্যাদি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলো। এবং এর জন্য সারা দেশে ব্লক স্তর পর্যন্ত বোর্ড গঠনের সুপারিশ রাখা হলো। লক্ষণীয় যে, পুরোপুরি এই বিলটির কার্যকর বিধি, কিংবা নিয়ম তৈরির কাজটি না করে, অথবা আইনে রূপান্তরিত না করে নির্বাচনের ঠিক প্রাক-মুহূর্তে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ভারতে প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উদ্যোগ বলে যে সব সুবিধা-সুযোগ দেওয়ার ঘোষণা তাকে যতই বৈপ্লবিক বলে চালাবার চেষ্টা হোক এটা অসংগঠিত শ্রমিকদের আইনী অধিকারের সম্প্রসারণ ঘটাবে না। মনে রাখা দরকার বর্তমান প্রভিডেন্ড ফান্ড আইন এবং ই এস আই আইনে কোন্ কোন্ পেশা বা কাজে যুক্ত শ্রমিকরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন যে 'সিডিউল' বলে তার কিছু কিছু সংশোধন বা সংযোজন ঘটালেই প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সুযোগগুলি শ্রমিকরা পেতে পারেন।

স্মরণ

পরিতোষ দুবে, ছিলেন আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন বন্ধু হারালাম।

□□

সোমেশ দাশগুপ্ত সংস্থার জন্ম থেকেই সুহৃদ। তাঁর প্রয়াণে আমরা একজন উপদেষ্টা, সহযোগী হারালাম।

নাগরিক মঞ্চ: ফেলে আসা দেড় দশক — কিছু স্মৃতি, কিছু মূল্যায়ন

চাই শুভ ভবিষ্যতের দিশা, বিকল্প কাঠামোর প্রস্তুতি

অজিত নারায়ণ বসু

১৯৮০ র দশকের শেষে বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবার জন্য এই সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এই সংগঠনের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ দিকের একটি হচ্ছে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে তাদের ওপর কোনোরকম সাংগঠনিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা না করা; বরং শ্রমিকরা যাতে নিজেরা আত্মনির্ভরশীল ভাবে নিজেদের সংগঠিত করতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা। অন্যদিক হলো, বিদেশী সাহায্যের ফাঁদে পা না দেওয়া, এবং ফলে নিজেদের ও সহযোগী বন্ধুদের ধ্যানধারণা মতো সংগঠনের কর্মপদ্ধতি ঠিক করা। এই শুরুর পর প্রায় ১৪ বৎসর কেটে গেছে। এর মধ্যে বহুবিধ দিকে মঞ্চের কাজকর্ম ছড়িয়ে পড়েছে। এর একদিকে রয়েছে পরিবেশ সম্বন্ধে চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা ও এই পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে যে শ্রমজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাদের পাশে দাড়ানো, এবং অন্যদিকে রয়েছে বহু সাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়ে ছোট-বড় পুস্তিকা ও পত্রিকার প্রকাশ।

এই কাজের মধ্যে রয়েছে কলকাতার পাশের জলাভূমি আন্দোলনে ঐ জলাভূমির অস্তিত্ব রক্ষা যাদের জীবিকার সঙ্গে জড়িত সেই শ্রমজীবীদের সংগঠিত হতে সাহায্য করা। প্রতি বৎসর আমাদের শ্রমিক আন্দোলনের যারা স্মরণীয় এবং বরণীয় তাদের এক এক জনের জীবন এবং কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ইতিহাস চেতনাকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা।

বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের একটা মাসিক ভাতা দেবার সফল আন্দোলনের শুরু করা।

দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকরা সামান্য কিছু যে আইনগত অধিকার অর্জন করেছেন সেগুলিকে বাস্তবে চালু করার জন্য দল-মত-নির্বিশেষে সমস্ত ট্রেড-ইউনিয়ন যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে তার জন্য চেষ্টা করা।

এই চেষ্টার মধ্যে পড়ে পেশাগত রোগের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে আন্দোলনের সূচনা করা এবং ঝাড়গ্রামের পাথরভাঙ্গা শ্রমিকদের ব্যাপারে কিছুটা সাফল্য অর্জন করা। ই.এস.আই. এবং পি.এফ.-এর সুযোগ থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য অর্থ মালিকদের লুঠের চেষ্টার বিরুদ্ধে সব শ্রমিক সংগঠন মিলে যৌথ আন্দোলনের চেষ্টা করা।

বন্ধ কারখানাগুলো, বিশেষ করে যেগুলি সরকার অধিগ্রহণ করেও চালু করছে না, সেগুলিকে শ্রমিক সমবায়ের মাধ্যমে চালাবার চেষ্টা করা, ইত্যাদি।

আমার মনে হয় এই মঞ্চের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে শ্রমজীবীদের দৈনন্দিন সর্ববিধ বঞ্চনার বিরুদ্ধে এখনই এই চলতিব্যবস্থার মধ্যেই যা যা করা যায় তা করার জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ব্যবস্থার বিকল্প নিয়ে, দীর্ঘমেয়াদি চলার দিশা নিয়ে, যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করা। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৯১ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কলকাতার (জোকা) আই. আই. এম.-এ শ্রীমনমোহন সিং, চিদাম্বরম ইত্যাদি 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি' নিয়ে যে আলোচনা সভা করেন সেইখানে খুব সম্ভবত নাগরিক মঞ্চই ছিল একমাত্র সংগঠন যারা সোজাসুজি ঐ 'নয়া অর্থনৈতিক নীতির' বিরোধিতা করেছিল।

চলতি অবস্থার মধ্যেই শ্রমজীবীদের দুর্দশা লাঘবের জন্য 'এখনই যা যা করা যায়' তা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী সহ সমগ্র দেশের চলতি দুর্দশার সৃষ্টিকর্তা হিসাবে চলতি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে, যে বিকল্প সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন, তার মোটামুটি কাঠামো স্থির করা। এই শুভ ভবিষ্যতে 'যা বস্তুগতভাবেই সম্ভব' সেই দিশায় যাবার জন্যই আশু সমস্ত কাজ করা — এই বোধহয় দেশের কাছে নাগরিক মঞ্চের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দিক। □

পথ চলা শুরু — 'ঘুমাবার আগে আযোজন পথ বাকি'

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

শিয়ালদা স্টেশনের ব্যস্ত ভিড়। আজকের ঝাঁ-চকচকে শিয়ালদা চত্বর নয়, দেড় দশক আগের কথা। হরেকরকম ব্যাপারির ভিড়, ইস্কুলের গাড়ি ইত্যাদির ভিড়। তারই মধ্যে একটি সভা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ ও রুগ্ন কলকারখানার দুরবস্থা, শ্রমিকদের দুর্দশা মোচনের জন্য আমজনতার দরবারে আবেদন রাখছিলেন বক্তা। বক্তব্য সাদা-সাপটা, বিরাট ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ আউড়ে বক্তব্য শেষ। যে বিষয়ে প্রধানত আকৃষ্ট হয়ে থমকে দাঁড়ালাম সেটা হলো ঐ সভাকে ঘিরে ম্লানমুখ শ্রমিকের ভিড় — দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা হলেও সভার কাজ ও প্রচারে তাঁদের তীব্র আগ্রহ। কোন্ রাজনৈতিক দল এমন জমায়েতের আয়োজন করেছে তা জানতে গিয়ে, ধাক্কা লাগল দ্বিতীয়বার। এটা নাকি কোনো রাজনৈতিক দলের সভা নয় — শ্রমিকরা সচেতন নাগরিকদের সঙ্গে জোট বেঁধে গড়ে তুলেছেন 'নাগরিক মঞ্চ'।

যে শ্রমিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তিনি ন্যাশানাল ট্যানারি নামে কলকাতার অতি বিখ্যাত এবং অতি প্রাচীন একটি কারখানার শ্রমিক; চামড়ার ব্যবসা লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও কোনো রহস্যজনক কারণে কারখানাটি রুগ্ন। সঙ্গে এসে যোগ দিলেন হাওড়ার আলামোহন দাশ প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার একজন সুপারভাইসর। সেই কারখানার রহস্য আরও অনেক জটিল। ওখানেই দেখা মিলল চিকিৎসার জন্য টাকা দেওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত শ্রমিকদের, ভবিষ্যনিধির টাকা মেরে পালিয়ে যাওয়া মালিকের কারখানার নিঃস্ব শ্রমিকের। একটা দাবি ছিল এই সভার — বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা দিতে হবে।

কলকাতার বহু রাস্তার নামই বহু ঐতিহাসিক ঘটনার চিহ্নবাহী। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির বাস থামার স্থানে যেমন কোনো পুলিশ ফাঁড়ির দেখা মিলবে না তেমনি বেলেঘাটা সি আই টি মোড় ছাড়িয়ে ফুলবাগানের দিকে এলে রত্না কেবিন বলে যে বাস থামার স্থানটি রয়েছে সেখানে রত্না কেবিনের দেখা আজকে আর মিলবে না। পূর্বের রত্না কেবিনের উল্টোদিকে গলি-ছাড়িয়ে চললে মিলবে বদন রায় লেন। আধা-প্রস্তুত বাড়ির আলসেহীন, পাঁচিলহীন দোতলায় বসেছে নাগরিক মঞ্চের মিটিং — নাগরিক মঞ্চের সদস্যদের কোনো সভায় সেই আমার প্রথম যোগদান।

এরপর কেটে গেছে বহু বছর । পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ই ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। সরকার বন্ধ কারখানা অধিগ্রহণ করেছে কিন্তু উৎপাদন না করে ফেলে রেখেছে। শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদের প্রাপ্য পাওনা থেকে। নাগরিক মঞ্চ পুস্তিকা প্রচার করে বিধায়কদের বুঝিয়ে এবং শেষপর্যন্ত আদালতের

দারস্থ হয়েছে — ন্যায়ালয় থেকে মাঝে-মধ্যে শ্রমিকদের সামান্য স্বস্তি মিলেছে; আবার কখনও আদালতের রায়ে শ্রমিকরা অসুবিধেয়ও পড়েছেন।

শেষ পর্যন্ত সরকার বিভিন্ন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে, বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার শিল্প শ্রমিকদের সামান্য হলেও ভাতার বন্দোবস্ত করেছেন, যদিও বর্তমানে সেই ভাতা প্রদান নিয়ে নতুন করে জটিলতা তৈরি হয়েছে। নাগরিক মঞ্চ-র যে একটি প্রধান দাবি (বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার শ্রমিকদের ভাতা প্রদান) তা সাধারণ নাগরিকদের মন স্পর্শ করেছিল এবং সেই দাবি আদায়ও হয়েছে।

নব্বই-এর দশকে সারা পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক অসন্তোষ তুঙ্গে ওঠে (বর্তমানে অবস্থাটা যদিও আগের তুলনায় কিছুমাত্র ভালো নয়, তবুও শ্রমিক অসন্তোষের চিহ্ন নেই, মনে হয় আপাতত 'শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে'!) কেন্দ্রীয় স্তরের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বকে অস্বীকার করে নতুন ধাঁচের শ্রমিক সংগঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ শ্রমিকরা কিছুটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছুটা সচেতনভাবে নাগরিক মঞ্চ-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন। চটকলের শ্রমিকরা যখন সংঘবদ্ধ হওয়া শুরু করেন তখন নাগরিক মঞ্চ তাদের হয়ে প্রচার শুরু করে। মালিকদের স্বার্থে পাটের দাম বাড়ানোর জন্য চটকল ধর্মঘটের বিরোধিতায় নামে নাগরিক মঞ্চ।

ইতিমধ্যে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে প্রোমোটারের থাবা বিস্তৃত হতে শুরু হয়েছে। ভেড়ি শ্রমিকরা নাগরিক মঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। এদিকে জীবনদায়ী ওষুধের কারখানা স্ট্যান্ডার্ড-ওপেক বন্ধ। শ্রমিকের অধিকার থেকে পরিবেশের অধিকার — মিলেমিশে একাকার হলো। আমরা বুঝলাম, কারখানার বাইরে যা পরিবেশ দূষণ, আমজনতার স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, কারখানার মধ্যে তা পেশাগত রোগ হিসেবে শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানি করে। ফলে নাগরিক মঞ্চের কার্যক্রমে শ্রমিক-শ্রম-স্বাস্থ্য-পরিবেশ যুক্ত হয়ে পড়ল।

সারা পূর্বভারতে পেশাগত রোগ নির্ণয়ের কোনো কেন্দ্র ছিল না — ফলে একটা ভুল ধারণা ছিল যে পশ্চিমবঙ্গে বুঝি পেশাগত রোগের অস্তিত্ব নেই। একে একে এলো রাধারমন পাইকার, নিতাই দাস — শ্রমিকদের পেশাগত রোগ সংক্রান্ত সুরক্ষায় মদত দিতে এগিয়ে এল মঞ্চ। তারপর এল চিচুড়গেড়িয়ার ঐতিহাসিক মুহূর্ত — এল আল্লানা কোম্পানির বিষয়। এল আরো কত কী।

আজকে মঞ্চ-র প্রকাশনা তার স্বকীয়তায় উজ্জ্বল — সমাজে মঞ্চর বক্তব্য মান্যতা পায়। তবে পথ চলা শুরু — 'ঘুমাবার আগে আয়োজন পথ বাকি'। □

নাগরিক মঞ্চের প্রথম দু বছর

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৮৯ সালে 'নাগরিক মঞ্চ' যখন তৈরি হয়, তার ক্যানভাসে ছিল একটিই ছবি : বন্ধ কারখানা আর বেকার শ্রমিক পরিবারের জীবন। প্রথম বুলেটিনে ছাপা হয়েছিল নৈহাটির ভাঙা গৌরীপুর জুট মিলের ছবি; পরের কয়েকটি সংখ্যায় : টেক্‌সম্যাকো, ন্যাশনাল ট্যানারি, বেণী ইনজিনিয়ারিং, দাস মেসিনারি — একটার পর একটা কারখানার ধ্বংসকাহিনী। সেইসব নিয়ে ১৯৯০ সালের দোসরা মে ইংরেজিতে প্রকাশিত হলো একটি সংকলন : *পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-অর্থনীতির বেসরকারি চিত্র*। অর্থাভাবে ছাপা সম্ভব হয়নি; সাইক্লোস্টাইল করা হয়েছিল বোধহয় শ-খানেকের মতো কপি।

শিয়ালদহ স্টেশন প্রাঙ্গনে একটি জনসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হলো সংখ্যাটি আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে নব দত্ত যখন সেইসব ভাঙাচোরা জীবনের গল্পগুলো বলছেন, দেখা গেল, ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। এরই মাঝখানে এক পশলা বৃষ্টি। শ্রোতারা একটু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলেন, বৃষ্টি থামতেই ফিরে এলেন আবার। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আমাদের।

চেহারায় আকর্ষণীয় না হলেও সংকলনটি কিন্তু অনেককেই টানল। শিয়ালদহের সভাতেই বিক্রি হয়ে গেল বেশ কিছু কপি। এর মাসখানেক পরে তাঁর ঘরে আমাদের ডেকে পাঠালেন প্রয়াত শ্রমিক নেতা, এককালের আন্দামান-বিপ্লবী গোপাল আচার্য। তিনি আরও বিস্তারিতভাবে শুনতে চান। সেই ঘরোয়া আসরে উপস্থিত ছিলেন বীরেন রায় আর অজিতনারায়ণ বসুও। তিনজনেই প্রবীণ ব্যক্তি — বহুদিন ধরে বামপন্থী আন্দোলন করেছেন। কিন্তু সব শুনে তাঁরা যেন বিমূঢ়। প্রশ্নটা তাই রয়েই গেল : কারখানাগুলো কি আবার খোলা সম্ভব হবে? শ্রমিক পরিবারগুলো কি বাঁচবে?

এই প্রশ্ন সামনে রেখেই তখন নাগরিক মঞ্চের কাজ এগিয়ে চলেছে। একটার পর একটা বন্ধ কারখানার খবর আসছে। বেকার শ্রমিকের আত্মহত্যা বা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর সংবাদ আসছে। নাগরিক মঞ্চের ছোট্ট ঘরে আর জায়গা হয় না; মিটিং চলে সামনের বারান্দায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, টানা লোড শেডিঙের মধ্যে। কোন্ কারখানা বি. আই. এফ. আর-এ চলে গেছে, কোথায় শ্রমিকদের বেতন থেকে মাসে মাসে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে — এইসব কাহিনী। নীচে বাজার। রাস্তার ওপারে দোকানে কেনাকাটা চলছে। আর বারান্দায় বসে আমরা শুনছি শ্রমিককে ভাতে মারার গল্প ; ছবিতে দেখছি : কারখানা দাঁড়িয়ে আছে একটা ফোঁপরা কংকাল হয়ে।

পরের বছর ২ মে, ১৯৯১ নাগরিক মঞ্চ প্রকাশ করে আর একটা সংকলন : *এগেনস্ট দ্য ওয়াল* — সেখানে বছর ধরে-ধরে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল ১৯৮৪-৯০ এই ছ-বছরে মারা গেছেন ৯৮২ জন শ্রমিক। আর ১৯৮৭-৯০ তিনবছরে আত্মহত্যা করেছেন ৪১ জন। মসজিদ-বাড়ি স্ট্রিটের একটি প্রেসে ছাপার কাজ যখন চলছে, একজন কর্মী বলে ওঠেন : এ কী লিখেছেন আপনারা? এ কী সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। নব দত্ত প্রস্তাব দিলেন, পুজোর আগে আমরা একটা মিছিল বের করব ট্যাবলো নিয়ে। শহরের মানুষ জানুক, তাদেরই প্রতিবেশী শ্রমিকরা কীভাবে বেঁচে আছে, অথবা মরে যাচ্ছে নিঃশব্দে। শহরের নানা প্রান্ত থেকে সেই মিছিল বিভিন্ন কারখানার সামনে দাঁড়াবে, তারপর সকলে সমবেত হবেন ধর্মতলায়। ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ এই মিছিলটা হয়েছিল। অনেক পরিশ্রমে ট্যাবলোটি সাজিয়েছিলেন দীপঙ্কর বসু আর বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মতলার সভায় কবিরা কবিতা পড়েছিলেন, সংগীত শিল্পীরা গান গেয়েছিলেন। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ — সভা যখন শেষের মুখে — খবর আসে : শ্যামনগরের গৌরীশঙ্কর জুট মিলে পুলিশ গুলি চালিয়েছে; মারা গেছেন রাজেশ্বর রাই নামে একজন শ্রমিক। কদিন পরে দুর্গাপুজোর শ্রীপঞ্চমীর দিন — মণ্ডপে মণ্ডপে যখন দেবী প্রতিমা — শ্যামনগরের শ্রমিক পল্লীতে গিয়ে আমাদের শুনতে হয়, শ্রমিকদের অপরাধ : তাঁরা অবসরের সময় তাঁদেরই বেতন থেকে কেটে নেওয়া টাকা ফেরৎ চেয়েছিলেন। এর দু সপ্তাহ পরে নাগরিক মঞ্চ একটা বিশেষ সংখ্যা বের করে; তার প্রধান রচনাটির শিরোনাম ছিল : 'শ্রমিকের বুকের ওপর গুলি চালিয়েছে পুলিশ'। □

স্ম র ণ

চারপাশে হাজারো সমস্যা, হাজারো বঞ্চিত মানুষ, অধিকার হরণের ঘটনা । .... নাগরিক মঞ্চের জন্মলগ্ন থেকে যে ছিল নিত্য সহচর .... এসব ঘটনা যাকে তাড়িয়ে বেড়াত .... বলা যায় যার বাড়িতে মঞ্চ গড়ে ওঠার উদ্যোগের শুরু.... তারপর .....হঠাৎ হঠাৎ ফোন বেজে উঠত ... বাপি'র গলা .... 'জলা বুজিয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে' খবরটা ...? ... এরকম হাজারো সমস্যার প্রতিকারের কথা ... সেই বাপি দত্ত হঠাৎ ২০০৩-এর এপ্রিলে, ... চিরকালের জন্যে চলে গেল। খবরটা এসেছিল আকস্মিক — বাপির কথা আজও আমাদের মনে পড়ে ... হয়তো পড়তেই থাকবে ....

সলতে পাকানোর কাজটাও তো বড় কম নয়

সিদ্ধার্থ সেন

নাগরিক মঞ্চের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ও প্রত্যাশার পূর্ণতা-অপূর্ণতা সম্পর্কে কিছু বলার অনুরোধ এসেছে। অনুরোধ রক্ষা সহজ নয়। কেননা, সহজ কথা যায় না বলা সহজে। সত্তরের দশকের শেষ থেকে শিল্পের প্রবল সংকট থাবা বসিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে — তার ফলে হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের চরম দুর্দশা, অসংখ্য অভাব এবং অনাহার মৃত্যু, তারওপর মিডিয়া এবং রাজনৈতিক দল, সরকার এবং প্রশাসনের নিদারুণ উদাসীনতা — এই সমস্ত কিছুর ফলশ্রুতিতে, মূলত মানবিক কারণে একদল মানুষ কিছু করার প্রেরণায় ১৯৮৯-এ নাগরিক মঞ্চ শুরু করেন।

এই কাহিনী আমরা নাগরিক মঞ্চের প্রথমদিককার সদস্যদের কাছে শুনেছি। কালক্রমে দেখা গেছে যে নিছক মানবিকতা রক্ষাও সম্ভব নয় বর্তমান অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কেননা যে হৃদয়হীনতা, উদাসীনতা এবং নিছক আত্মচরিতার্থতার রাজনৈতিক বাতাবরণ কায়েম হয়ে বসেছে সেখানে শিল্পের সংকটে যারা শহিদ হতে চলেছেন তাদের ন্যূনতম সুরাহা করতে গেলেও এমনধরণের সমাজপরিবর্তনের দরকার, যা নাগরিক মঞ্চের মতো সংগঠনের নাগালের বাইরে। যদিও জনমত সংগঠন এবং সচেনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় বরাবরই নাগরিক মঞ্চ এগিয়ে। নিছক লেখাজোখা নয়। কি করে শ্রমিকরা হাতে কলমে, আইনী অথবা অ-আইনী পদ্ধতিতে লড়াই করতে পারেন নিজেদের কারখানা রক্ষা করার জন্য, জীবিকা রক্ষার জন্য, ন্যায্য পাওনাগণ্ডা বুঝে নেওয়ার জন্য, সে-ব্যাপারেও নাগরিক মঞ্চ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শ্রমিকদের সহযোগী শক্তি হিসেবে নাগরিক মঞ্চ এক উল্লেখযোগ্য Pressure Group যার চেষ্টায় অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ঘটেছে। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মাসিক ক্ষতিপূরণের দাবি যা ১৯৯৭ সালে Plight of Labour নামক জনআদালত সংগঠনের মধ্য দিয়ে জোরদার হয়ে উঠেছিল — সে দাবি শেষপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেনে নিতে বাধ্য হন। শিল্প ও শ্রমের স্বার্থরক্ষায় যে পরিবেশের গুরুতর ভূমিকা আছে সেই উপলব্ধিও আমাদের ঘটে। এবং পরিবেশ রক্ষায় ও শিল্পদূষণঘটিত গুরুতর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণও আদায় হয় ভারতে সর্বপ্রথম নাগরিক মঞ্চের চেষ্টায় — সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চিচুড়গেরিয়ার পাথর ভাঙা শ্রমিকদের বিষয়ে। পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব, শ্রমিকের স্বার্থেই এক নতুন মাত্রা পায়।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আজ মনে হয় যে কতটুকু আমরা করতে পেরেছি বর্তমান দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা আদৌ এই 'হাতে কলমে করতে পারা' কতখানি সম্ভব। আর যাই হোক নাগরিক মঞ্চ রাজনৈতিক দলও নয় ট্রেড ইউনিয়নও নয়। তার সদস্য-সহযোগীরা পার্টি হোলটাইমার নন। প্রথাগত শ্রমিক আন্দোলন-মিটিং-মিছিল-ঘেরাও-ধর্না-ধর্মঘট ইত্যাদি, যা সাধারণত ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় পড়ে, তা আমাদের কতখানি করণীয়? করণীয় নয় কেননা ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকরা যা করবেন তাতে আমরা তার সহযোগী হতে পারি বিশেষ ক্ষেত্রে, কিন্তু কখনওই সংগঠক নয়।

যা আমরা অনেক বেশি করে করতে পারি তা হল জননীতি ও জনস্বার্থরক্ষায় মতামত গড়ে তোলা ও তার সপক্ষে বিশাল তথ্য ভাণ্ডার নির্মাণ। সেইরকম সমাজ পরিবর্তনের জন্য যা আমরা দরকার মনে করি তার সপক্ষে এই তথ্যভাণ্ডার বিপুল সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে। আমরা আরো বেশি বেশি গবেষণামূলক কর্মে নিযুক্ত হতে পারি শ্রমিক-শিল্প ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে, আলোকপাত করতে পারি সেইসব দিগন্তে যা শাসক-শোষকদের লুকিয়ে রাখা কলাকৌশল ও প্যাঁচপয়জার চিহ্নিত করে। চিহ্নিত করে সেইসব রণকৌশল ও রণনীতি যা শ্রমিক-শিল্প ও পরিবেশ রক্ষায় একান্ত জরুরি। এই যুদ্ধে আমরা অস্ত্রসঞ্চালক বা অগ্নিসঞ্চালক না হতে পারি কিন্তু যে আগুন জ্বালায় তার তুলনায় কি যে বারুদ বানায় তার ভূমিকা কিছু কম? □

অপনী বাত

দিন ব দিন বন্দ হোতে জা রহে কল কারখানোঁ বে দানে দানে কো মুহতাজ শ্রমিকোঁ কী ভূখ সে হো রহী মৌত যা উনকা ভূখ সে বেজার হো খুদকুশী কা রাস্তা অপনানা, দিন ব দিন প্রদূষিত হোতে জা রহে বাতাবরণ কে কারণ সামান্য জিন্দগী জীনা দুষ্কর হো জানে জৈসে হালাত কে বাবজুদ লোগ চুপ ক্যোঁ হৈঁ? সমাজ কা প্রবুদ্ধ বর্গ ঔর রাজনীতি সে জুড়ে লোগোঁ কো য়ে সবাল ঝকঝোর ক্যোঁ নহীঁ রহে হৈঁ? ইন সমস্যাওঁ কী অসলী বজহ ক্যা হৈ? ঔর ইনকা ক্যা হল যা বিকল্প হৈ? ইন সবালোঁ কা জবাব তহে দিল সে ঢুঁঢনে কী জরুরত নে করীব ৭৪ সাল পহলে নাগরিক মঞ্চ (অব পূর্ব কোলকাতা নাগরিক মঞ্চ) কো জন্ম দিয়া।

নাগরিক মঞ্চ শুরু সে হী য়হ বতানে কা প্রয়াস করতা রহা হৈ কি ইন সমস্যাওঁ কা হল ইনসে মুঁহ চুরানা নহীঁ বরন গংভীরতা সে ইনকা সামনা করতে হুয় হল কা পথ ঢুঁঢনা হৈ। হর সমস্যা কা হল হৈ বশর্তে উসকে লিয়ে সংজীদগী সে কোশিশ কী জায়। অমানবীয় হালাত কো উজাগর করনা ব মানবাধিকারোঁ কী বহালী কে মকসদ সে গঠিত হুয় নাগরিক মঞ্চ নে ইন ডেঢ দশকোঁ মেঁ অনেক উতার চঢ়াব দেখে হৈঁ। সরকার কো বংদ কারখানোঁ কে শ্রমিকোঁ কো ৫০০.০০ রুপয়ে কা মাসিক গুজারা ভত্তা দেনে কে লিয়ে মজবূর করনে তথা চিঁচুরগঢ়িয়া কী পত্থর খদান কে মজদূরোঁ ব উনকে আশ্রিতোঁ কো মুআবজা দিলবানা, পেশাগত রোগোঁ কে নিদান, চিকিত্সা ব প্রভাবিত শ্রমিকোঁ কো মুআবজা দিলানে কা শ্রেয় নাগরিক মঞ্চ কো হী জাতা হৈ ফির ভী অনগিনত ঐসী কোশিশেঁ হৈঁ জিনমেঁ উম্মীদ কে অনুরূপ কামযাবী নহীঁ মিলী।

নাগরিক মঞ্চ কা দৃঢ় বিশ্বাস হৈ কি তথ্যোঁ কো সংঘর্ষ মেঁ হথিয়ার কে তৌর পর ইস্তেমাল কর কামযাবী হাসিল কী জা সকতী হৈ। আজ নাগরিক মঞ্চ কে তথ্য ভণ্ডার মেঁ করীব ৩০০০ পুস্তকেঁ, দস্তাবেজ, রপট আদি হৈঁ। নাগরিক মঞ্চ অব তক অপনী ৩৯ পুস্তকেঁ ব রপট প্রকাশিত কর চুকা হৈ। উসকা অপনা মাসিক বুলেটিন 'মঞ্চ সংবাদ' হৈ।

নাগরিক মঞ্চ মানবীয় সংবেদনা কে হর পহলূ পর অনগিনত মেঘাওঁ কো এক মঞ্চ পর লানে, জনজীবন সে জুড়ে নসলোঁ পর সংবেদনশীল, ঈমানদার ব নির্ভীক লোগোঁ কা সহযোগ হাসিল করনে কী হরসংভব কোশিশ করতা রহা হৈ ঔর করতা রহেগা। ইস প্রয়াস মেঁ জহাঁ উসে অনগিনত হাথোঁ কা সহযোগ মিলা বহীঁ উসে অপনে বাপী দা (রবীন দত্ত), সোমেশ দাসগুপ্ত ঔর পরিতোষ দুবে জৈসে সাথিয়োঁ কা বিছোহ ভী সহনা পড়া হৈ জিনকে অমূল্য যোগদান নাগরিক মঞ্চ কা সবল রহা হৈ। নাগরিক মঞ্চ কো ঐসে হর শখ্স সে সাথ চলনে কী অপীল করতা হৈ জো দিল সে মবসূস করতা হৈ কি হর মেহনতকশ কী রোজী মহফূজ রহনা চাহিএ, হর আদমী কো সম্মান কে সাথ জীনে কা হক মিলনা চাহিএ। □

Declaration No. 21 dated 16.2.2004

Owend, printed and published by Naba Dutta. Printed from Design and Printing, 134 Raja Rajendralal Mitra Road Kolkata 700 085 and Published from 134 Raja Rajendralal Mitra Road, Room No. 7, Block B, Kolkata 700 085. Editor : Naba Dutta.